BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 11(16), 2015: 79-86
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্বের উন্নয়নে গণমাধ্যমের প্রভাব এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ব্যবহার ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক*

সারসংক্ষেপ: গণমাধ্যম আধুনিক জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিশুশিক্ষা ও তাদের মনস্তত্ত্ব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। নির্দিষ্ট কারিকুলাম বা পাঠক্রমের অধীনে যাওয়ার আগেই বিভিন্ন পরিবেশে শিশুরা তাদের ভাষাজ্ঞান ও সমাজ সামাজিক জ্ঞানের অনেক কিছু রপ্ত করে নেয়। এ জন্য গণমাধ্যমসমূহ যে সব কৌশল ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের আকৃষ্ট করে থাকে তা তাদের পরবর্তি জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষত টিভিতে বিভিন্ন ধরনের কার্টুনে প্রতি শিশুরা মোহগ্রস্ত। ইসলাম তার মূল্যবোধ শিশুমনে গ্রোথিত করার জন্য বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বারোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সকল মাধ্যম, এমনকি গণমাধ্যম ব্যবহারেও গুরুত্বারোপ করেছে ইসলামি আদর্শ প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত। যা কুরআন-সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবি সা. এর জীবনাচারেও প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাই-ই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, গণমাধ্যম, মনস্তত্ত্ব এবং পরিবেশ।

ভূমিকা

গণমাধ্যম আমাদের ঘিরে রেখেছে নানাভাবে। গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করেই আমরা পরিবর্তিত হচ্ছি। পরিবর্তিত সমাজ তথা বিশ্বে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবজীবন প্রণালীতে গণমাধ্যমের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, বয়স, রুচি, আচার আচরণ, সংস্কৃতি ভেদে এ গণমাধ্যমের প্রয়োগ, প্রভাব ও উপযোগিতাও ভিন্ন। গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধরণ ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন মাত্রায় কাজ করে।

নানা ধরণের গণমাধ্যমের মধ্যে দর্শন ও শ্রবনেন্দ্রীয় মাধ্যম সব শ্রেণি পেশার উপযোগী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে শিশু ও নিরক্ষরদের জন্য রেডিও, টেলিভিশন খুবই কার্যকরী গণমাধ্যম। এছাড়াও কম্পিউটার, চলচ্চিত্র, সিডি, পোস্টার, কার্টুনসহ বিভিন্ন প্রদীপণ তো রয়েছেই।

গণমাধ্যমের দুই প্রধান শাখা বেতার ও টেলিভিশন শিশু উপযোগী নানা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করে চলেছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ তৈরি এবং সে পরিবেশে শিশুদের খাপ খাওয়ানো, নিয়মিত আসা-যাওয়া করানো এবং কিছু নিয়ম নীতি অনুসরণে উৎসাহিত

* মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ, রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা এবং সম্পাদক, ডেইলি প্রেস ওয়াচ, বাংলাদেশ, E-mail: dipu.siddiqui@gmail.com

করে পরবর্তিতে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মূলত প্রাক-লিখন, প্রাক-পঠন ও প্রাক-গণিতের সমষ্টি। এর সঙ্গে রয়েছে ছবি আঁকা, ছড়া-গল্প বলা, নাচ, গান ও খেলাধুলা। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় শিখন দক্ষতা সহ মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।[১] এ কারণে এ শিক্ষাকে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ও বলা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল কথা শিশুর সঠিক ও সাবলীল বিকাশ সাধন। এ শিক্ষায় শিশুরা নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করবে। ছবি আঁকবে, ছন্দে আনন্দে গান করবে। কারণ শিশুর শেখার প্রবৃত্তি সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

শিশু মনস্তত্ত্ব

শিশু শিক্ষার পরিবেশ হবে শিশু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, অনুকূল পরিবেশে প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। ফ্রয়েবলিয়ান দর্শন ও সাহিত্য অনুসারে নার্সারি ও প্রাক-শৈশব শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও অভ্যাসের উন্নয়ন নয় বরং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা। প্রাক-বিদ্যালয়ে শিশুদের জ্ঞান ও তথ্যের ওপর বেশি জোর না দিয়ে কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর স্বাধীনতা, সুখ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করার মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক গুণাবলির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সাধন, যা কয়েক পৃষ্ঠা শব্দ তৈরি বা বানান শিক্ষার বইয়ের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২] তাই শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দানের ফলে শিশু পারিবারিক বলয়ের বাইরে নতুন পরিবেশে সমবয়সীদের মেলামেশার সুযোগ পায় যা বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি শিশুকে আগ্রহী করে তোলে।

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বসহ সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকার শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ পত্রে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। উক্ত কমিটি মোট ছয়টি উপকমিটির ১নম্বর উপকমিটি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এ কমিটি শিশুজন্মের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর পূর্ব পর্যন্ত শিশুর বয়সকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

ক. জন্ম থেকে ৩/৪ বছর পর্যন্ত;

খ. ৩/৪ বছর বয়স থেকে ৬/৭ বছর বয়স পর্যন্ত।

এ বয়সটি একটি শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়েই একটি শিশুর ভাষাজ্ঞান, মূল্যবোধ, মানসিক অবস্থা, আচার-আচরণ সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এসব দিকে শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ কিংবা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে দিলে তা অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

---

[১] সিরাজুদ দাহার (সম্পাদিত) অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন গাইড প্রাথমিক শিক্ষা ইন্টার‍্যাকশন, ২০০৫, পৃ. ২০৬।

[২] বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২০।

গণমাধ্যমের প্রভাব

আমরা জানি ব্যক্তির শিক্ষার শিক্ষাগ্রহণ চলে বিভিন্ন ধাপে, বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে শিক্ষার তিনটি ধরন বা প্রকাশ রয়েছে। তা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনুষ্ঠানিক শিক্ষা। গণমাধ্যমের প্রধান কাজ শুদ্ধভাবে পরিচালিত মার্জিত তথ্য জনগণের কাছে উপস্থাপন করা। গণমাধ্যমে শিশু শিক্ষার বিষয়টি অনানুষ্ঠানিকভাবে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সম্পাদিত হয়।

শিশুর প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চরিত্র গঠন, মৌলিক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন, জীবনের জন্য প্রস্তুতি, সমষ্টিগত মনোভাবের বিকাশ, সুনাগরিক সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের উৎসাহ সৃষ্টি, সভ্যতা, উন্নয়ন, আবেগিক ঐক্যের উন্নয়ন, অন্য সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ও সামঞ্জস্যতা বিধান তথা আন্তর্জাতিক অনুভূতির বিষয়গুলো কোনোরূপ চাপ, ভয় কিংবা আদরের মাধ্যমে বাধ্য করা ব্যতিরেকেই শিশুর মধ্যে সৃজন হতে থাকে। আর ক্রমে ক্রমে শিশুটি এসব আয়ত্ত্বাধীন করে ভবিষ্যত শিক্ষার পথটিকে প্রশস্থ ও মসৃণ করে তোলে গণমাধ্যমের কল্যাণে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়, যা দেখে শুনে সহজে ও দ্রুত তা শিখে ফেলে। কিন্তু কোনক্রমেই শিখানোর জন্য তাকে নির্দিষ্ট কোনো ছকে বাধা যায় না। অনেকটা প্রকৃতির মাঝে ছেড়ে দেওয়ার মতো। যেমনি মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছ থেকে জীবন প্রণালী আয়ত্ত্ব করে তেমনি টেলিভিশনের বাহারী নান্দনিক নানান রং ও চিত্রের সমন্বয়ে সুরেলা আবহযুক্ত কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর উপস্থাপন খুব সহজে শিশুর দৃষ্টি কাড়ে। নিত্য-নতুন বিষয়বস্তুর প্রতি কৌতুহলী হয়ে পড়ে। ফলে মনোযোগ, স্মৃতি, আবেগ, অনুভূতি শক্তিসমূহের চর্চার মাধ্যমে শিশুটি ভবিষ্যতে অধিকতর চৌকস ও দক্ষ সম্পদে পরিণত হতে থাকে।

আধুনিক যুগের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ করে দর্শন ও শ্রবনেন্দ্রীয় গণমাধ্যমগুলো বেশ উৎকর্ষ সাধন করেছে। যা বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে আনন্দের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ, শিক্ষিত মানবসম্পদ গঠনে গণমাধ্যমের উপযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং সম্ভবপর হচ্ছে। আমাদের দেশে সিরিয়াল সিসিমপুর, মীনা কার্টুন বেশ দর্শক প্রিয়তা অর্জন করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে টিভি সেটের সামনে আগ্রহ-কৌতুহলভরা দৃষ্টিপাত করেছে শিশুরা। কখন 'সিসিমপুর' কিংবা 'মিনা' কার্টুন শুরু হবে। শুধু তাই নয় জনসার্থে প্রচারিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোও শিশুদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পানির অপচয়, গ্যাসের অপচয়, কিংবা ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ নোংরা রোধ, যক্ষা, কৃমি সংক্রমণ, এইডস সহ আয়োডিন ও ভিটামিনের অভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্বিষহ জীবনের চিত্র নানা মজাদার দৃষ্টিনন্দন নাটকীয়তা ও প্রযুক্তির কল্যাণে আরো বেশি শৈলিক উপস্থাপনা শিশু ও নিরক্ষরকে সহজে দ্রুত সচেতন করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে গণমাধ্যমগুলো।

এছাড়াও শিশুনির্ভর বিদেশি কার্টুন চ্যানেল, ডিসকভারি, ন্যশনাল জিওগ্রাফি, এ্যনিমেল প্ল্যানেট, পিস টিভি ইত্যাদি চ্যানেলগুলো প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নির্ভর জাতি গঠনে অবদান রাখছে।

তবে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিও টিভি চ্যানেলগুলোর এই শক্তিশালী উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও এর সর্বোচ্চ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। শুধু তাই নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারে শিশুদের চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। হরর ছবি, দাঙ্গা, মারামারি, অশ্লীল ডায়ালগ, স্ব-

সংস্কৃতি বিরুদ্ধ পোশাক ও আচার আচরণ নির্ভর কতিপয় নাটক, সিনেমা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ধাবিত করছে।

শিশু-শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব গঠনে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ব্যবহার ও গুরুত্ব

একটি শিশু জন্ম নেয়ার পর তার সঠিকভাবে লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। শিশুটি জন্ম নেয়ার পূর্বে তার গর্ভধারীনি মায়ের ভরণ-পোষণ, অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষাকে ইসলাম অত্যাবশ্যক করেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

> যার সন্তান জন্ম দেয়া হবে তার পর দায়িত্ব হলো সুন্দরভাবে গর্ভধারিনী মহিলাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করা।[৩]

শিশুর মনস্তত্ত্ব তাওহিদের ভাবধারায় গড়ে ওঠার জন্য জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তার কানের কাছে আযান দেয়া হয়। মহানবি সা. এর নাতিদ্বয় হাসান ও হুসাইন রা. জন্ম গ্রহণ করার পর তাদের কাছে আযান দেয়া হয়েছিল। আর আযান হলো অন্যতম একটি গণমাধ্যম। এ জন্য সালাত ছাড়া অন্যান্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাগত হলে মহানবি সা. মসজিদে নববিতে আজান দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতএব এ আযানের মাধ্যমেই শিশুকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো হয়, তাওহিদের সুমিয় বাণী শুনানো হয়। তার মনস্তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করা হয় বলে দাবি করা যায়।

এমনিভাবে আরবে সঠিক ভাষাজ্ঞানসহ বিভিন্ন দিকে শান্ত শিষ্ট পরিবেশে শিশুকে লালন-পালন করার জন্য ধাত্রী মায়ের নিকট হস্তান্তর করা হতো। এমনকি মহানবি সা.-কেও শিশুকালে একই ব্যবস্থায় লালন-পালন করা হয়। মহানবি সা. পরবর্তিতে তাঁর দুগ্ধমাতাকে গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে এ বিষয়টি অনুমোদন করেছেন বলে পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিশুকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বড়দের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বৈঠকে নিয়ে যাওয়া যায়। যা তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালিব ও চাচা আবু তালিব করেছেন। কুরআনে সুরা আদ দোহায় এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে ঐ সব কাজ আল্লাহর অদৃশ্য নির্দেশনায় বা ইচ্ছায় সম্পাদিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবি সা. নিজেও স্বীয় নাতীদ্বয় হাসান রা. ও হুসাইন রা. নিয়ে খেলেছেন এবং উৎসবে শরীক হয়েছেন। এমনকি সালাতের জামাতেও শরীক হয়েছে। কারণ শিশুরা পরিবেশ থেকেই বেশি শিখে থাকে। পরিবেশের প্রভাব তাদের ওপর অনেক বেশি পড়ে থাকে। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

> প্রত্যেক জন্ম নেয়া শিশু ফিতরাত তথা সহজাত সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতা-মাতা হয় তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান কিংবা মাজুসি বানায়।[৪]

---

[৩] সুরা বাকারা, ২: ২৩৩।

[৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জানাইয, বাব মা কাবলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন, হাদিস নম্বর ১৩৮৫।

সুতরাং এ পরিবেশের ওপর গণমাধ্যমসমূহ প্রভাব ফেলে থাকে। এ মাধ্যমসমূহ যে পরিবেশ তৈরি করে তা থেকেই শিশুরা বেশি শিখে, তাদের ওপর বেশি প্রভাব পড়ে।

মহানবি সা. এর সময়কালে গণমাধ্যম বলতে পত্রাবলী, জনসম্মুখে খুতবা বা ভাষণ বক্তৃতা ও কবিতা পাঠের আসর, আযান, মেলা, উৎসব ইত্যাদিকে বুঝাতো। এসব মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়ায় শিশুদেরকেও অংশগ্রহণ করাতেন। শিশুরা যেন এসবের মাধ্যমে শিখতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতেন। শিশুরা আযান শুনে মসজিদে হাযির হতো। তারাও বক্তৃতা শুনতো, কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করতো, বড়দের আচার আচরণ দেখতো ও শিখতো। কার্যত মহানবি সা. বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّ

সে আমার উম্মত ভুক্ত নয়, ছোটদেরকে আদর করলো না এবং যে বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানলো না।[৫]

এ জন্য সাহাবায়ে কেরামও ছোটদেরকে খুবই স্নেহ আদর যত্ন করতেন। এর মাধ্যমেও তারা শিখতো।

মহানবি সা. শিশুদের শিক্ষার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। বিশেষত ভাষা শিক্ষণ ও লিখনের ব্যবস্থা করতেন। বদর যুদ্ধে যারা বন্ধী হয়ে মদিনায় আনীত হয়েছিল, তাদের কাউ কাউকে তিনি এ শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন, তারা প্রত্যেকে দশটি শিশুকে লেখা দিবে।

বস্তুত তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত সকল গণমাধ্যমকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, যার আওতায় শিশুরাও ছিল। যুগে যুগে নতুন নতুন মাধ্যমের উদ্ভব হবে। এটাই মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। যা কুরআনেও বর্ণিত:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আর ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তোমরা এগুলোকে বাহন ও আভিজাত্য হিসেবে ব্যবহার করতে পার এবং তিনি আরো অনেককিছু সৃষ্টি করতে থাকবেন, যা তোমরা জান না।[৬]

সুতরাং মহানবি সা. সমসাময়িক কালের পর আজ অনেক ধরনের নতুন নতুন মাধ্যম তৈরি হচ্ছে, যা তাঁর সময়ে ছিল না। যেমন: পত্রিকা, রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি। ভবিষ্যতে আরো অজানা অনেক মাধ্যম আবিস্কৃত হবে। যা আজ আমরা জানি না। অতএব মহানবি সা. যেহেতু তাঁর সময়ে সকল মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তাই যুগে যুগে যত মাধ্যম উদ্ভাবিত হবে সবকিছু ব্যবহার করতে হবে বা ব্যবহার করার বৈধতা রয়েছে। তবে ইসলামি মূল্যবোধের দিকে লক্ষ্য রেখে তা করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, মহানবি সা. মক্কায় সাফা পাহাড়ে অনেক মানুষের জমায়েত করেছিলেন। সেখানে লোকজনকে ডাকার প্রথাটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এ লক্ষ্যে ঘোষক বিবস্ত্র হয়ে মাথায় কাপড় বেধে দৌড়াদৌড়ি করতো এবং সাফা পাহাড়ে জমায়েতের আহ্বান জানাতো। একই লক্ষ্যে মহানবি সা. ইসলামি দাওয়াত দেয়ার নিমিত্ত তাদেরকে সাফা পাহাড়ে জমায়েত হওয়ার জন্য ডেকেছেন, যেজন্য তিনি নিজেকে নাযিরুল উরইয়ান বা উলঙ্গ সতর্ককারী বলে অবহিত করেছেন। যদিও তিনি সে সময়ে উলঙ্গ হননি। ইসলামি মূল্যবোধের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

---

[৫] মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২।

[৬] সুরা নাহল, ১৬: ৮।

এছাড়া, শিশু, কিশোর, যুবক, বয়স্ক, বৃদ্ধ সকল স্তরের মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য নির্দেশ রয়েছে। ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার ও প্রসারে আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন। মুসলমানদের হাতে রয়েছে তাওহিদের আমানত, বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী জীবন-বিধান ইসলামের আমানত, যা পৃথিবীর সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সকল মুসলিমের ওপর পবিত্রতম দায়িত্ব। এ কাজের অপরিসীম গুরুত্ব। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।[৭]

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বল, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৮]

নবি সা. এরশাদ করেন:

فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

আল্লাহর কসম। আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকে হেদায়েত দেন তবে তা লাল উটের চেয়ে উত্তম।[৯]

এমনিভাবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা প্রযুক্তি জ্ঞানের ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তোমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও হিকমাহ ও মাউয়েযা হাসানা (উত্তম বচনের) মাধ্যমে।[১০]

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য ইসলামের অমিয় বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেয়া; আম্বিয়ায়ে কেরাম ও দ্বীনের দাঈগণ যেভাবে স্ব স্ব যুগের প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমাদের যুগের প্রচার মাধ্যমগুলো যথার্থরূপে ব্যবহার করা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে

---

[৭] সুরা ফুস্সিলাত, ৪১: ৩৩ ।

[৮] সুরা ইউসুফ, ১২: ১০৮।

[৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারি, সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফাদলু মান আসলামা , হাদিস নম্বর ৩০০৯।

[১০] সুরা নাহল, ১৬: ১২৫।

সমকালে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। অভূতপূর্ব বিপণ্ডব সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির সকল শাখায়। ফলে মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করার পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বজুড়ে ভিন্নতা এসেছে দাওয়াত ও প্রচার কৌশলে। আগে দাঈগণ বাজারে, বিভিন্ন লোকসমাগম স্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে একজন দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) ঘরে বসেই রেডিও, টিভি, সিডি, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি মানুষের দুয়ারে। এটিকে সহজ ও গতিশীল করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যবিনিময় মাধ্যম ইন্টারনেট।

তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে যাদের কাছে তথ্য রয়েছে তারাই হবে আধুনিক পৃথিবীর প্রভাবী শক্তি, কথাটি আমাদের অনেকেরই জানা। আর এটা নিঃসন্দেহ যে ইসলামের তথ্যভাণ্ডার সুবিশাল ও সুদূরবিস্তৃত এবং পবিত্রতম। তাই ইসলামি তথ্যভাণ্ডারের বিশ্বময় প্রবাহ সুনিশ্চিত করতে পারলে মুসলিমরাই হবে বর্তমান পৃথিবীর সেরা এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তাদের কাছে পবিত্র ওহির যে তথ্য রয়েছে তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে যখন কোনো আধুনিক মিডিয়ার জন্ম হয়নি, তখনই রসুল সা. তাদের কাছে অর্পন করেছেন। তিনি বলেছেন:

بلغوا عني ولو آية

তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।[১১]

কুরআন-সুন্নাহ্‌র বাণীসমগ্রে গণমাধ্যমের ব্যবহার বিষয়ক বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে সাধারণ ঘোষণার নমুনায় মিডিয়া ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন:

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করল, ‘ওহে কাফেলার লোকজন, নিশ্চয় তোমরা চোর’। তারা ওদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোমরা কী হারিয়েছ’? তারা বলল, ‘আমরা বাদশাহী পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দেবে, তার জন্য রয়েছে এক উট বুঝাই পুরস্কার। আর আমিই এর যামিন।[১২]

এরও আগে সুলাইমান আ.-এর যুগে তথ্য সংগ্রহের জন্য (এটিও তথ্য মাধ্যমের কাজ) একটি পাখি কাজ করেছে। যেমন জানা যায় রানী বিলকিসের ঘটনা থেকে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

---

[১১] মুসনাদ আহমদ, (বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১৯৯৮খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

[১২] সুরা ইউসুফ, ১২: ৭০-৭২।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

আর সুলাইমান পাখিদের খোঁজ-খবর নিল। তারপর সে বলল, 'কী ব্যাপার, আমি হুদহুদকে দেখছি না; নাকি সে অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত? অবশ্যই আমি তাকে কঠিন আযাব দেব অথবা তাকে যবেহ করব। অথবা সে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসবে। তারপর অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে বলল, আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি সাবা থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। 'আমি এক নারীকে দেখতে পেলাম, সে তাদের ওপর রাজত্ব করছে। তাকে দেয়া হয়েছে সবকিছু। আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন।[১৩]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা ও উদাহরণের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম প্রচারের জন্য সম্ভাব্য সকল মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। এমনকি মনুষ্য জাতির বাইরেও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে যদি সামর্থ্য থাকে, যেমন সুলায়মান আ. পাখি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ তারাই ভবিষ্যত সমাজের কর্ণধার হবে, তারাই সকল ক্ষেত্রে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষত সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলায় বেষ্টিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বের সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন সে প্রাতিষ্ঠানিক সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থায় জীবন ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে, শুদ্ধভাষা রপ্ত করবে। এ জন্য ইসলাম শিশুর এ সময়কালটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

গণমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী কার্যকরী মাধ্যম। এর মাধ্যমে কোনো ভালো বিষয়বস্তু যেমনিভাবে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায় তেমনি খারাপ অসুস্থ বিষয়বস্তু ছড়িয়ে দ্রুত সংক্রমিত করা যায় গোটা জাতিকে। এটাকে পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। কুরআন-হাদিস অনুসরণ এবং এর সঠিক ব্যবহারই নিশ্চিত করতে পারে মঙ্গলময় সুস্থ সুন্দর জাতি।

গ্রন্থপঞ্জি

আসাদ, আবুল, তথ্য সাম্রাজ্য এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, জানুয়ারি ১৭, ১৯৯৪।

আনোয়ার, আহাম্মদ তৌহিদুল, উন্নয়ন যোগাযোগ গবেষণা: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, উনবিংশ সংখ্যা, জুন, ১৯৮৪।

আনওয়ারী, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, ইসলামি দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৩।

দাহার, সিরাজুদ (সম্পাদিত), অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন গাইড প্রাথমিক শিক্ষা ইন্টার‍্যাকশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২০৬।

Schramm, W, *Mass Media and National Development*, Stamford University Press, Stamford, California, 2005.

[১৩] সুরা নামল, ২৭: ২০-২৩।